ভাগাভাগির বাইরে নদী নিয়ে ভাবনা

আবুল হাসান রুবেল

বাংলাদেশের বড় বড় নদীর কোনোটিরই উৎস বাংলাদেশে নয়। সেগুলো একাধিক দেশে প্রবাহিত অভিন্ন নদী। এ রকম অভিন্ন ৫৭টি নদীর ৫৪টিই এসেছে ভারত থেকে। ফলে এ ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারক, ভারত এই সব নদীর প্রায় সবগুলো থেকেই তাদের ইচ্ছানুযায়ী পানি প্রত্যাহার করছে, নদীতে নানা স্থাপনা নির্মাণ করছে বাংলাদেশকে অবহিত না করেই। বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষত তিস্তা নদীর দৃষ্টান্ত টেনে ভারতের উন্নয়ন নীতির কারণে বাংলাদেশের নাজুক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

একটা জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্তা হিসেবে নদীর একটা নিজস্ব শুরু-শেষ আছে। আছে তার নিজস্ব জীবনচক্র। কখনো নদী প্রমত্তযৌবনা, উচ্ছল, কখনো শান্ত। কখনো কখনো প্রাকৃতিক কারণেই সে দিক বদলায়, এমনকি প্রাকৃতিক কারণে তার মৃত্যুও হতে পারে। বাংলাদেশের নদীগুলোর ক্ষেত্রে ১৭৮৪ সালে বিশাল ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমানে নতুন খাতে যমুনা নামে প্রবাহিত হয়। তিস্তা পদ্মা ছেড়ে যমুনায় মিলিত হয়। একসময়ের প্রবল করতোয়া তিস্তার সাথে সংযুক্ত ছিল, ১৭৮৭ সালে এক প্রবল বন্যায় এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে করতোয়া খর্বকায় নদীতে পরিণত হয় (মৃধা, ১৯৯৯)। এগুলো সবই প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু এ রকম বড় বড় প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়াও নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে, ক্ষীণ হয়ে আসে তার ধারা। সেগুলো ঘটে শত শত বছর ধরে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ২২৫টিতে নেমে আসা, কিংবা বেশির ভাগ নদীরই প্রবাহ হারিয়ে ফেলার কারণ মোটেই প্রাকৃতিক নয়। এর কারণ অপরিণামদর্শী উন্নয়ন নীতি, নদী লুট, দখল। বাংলাদেশের ৫৪টি নদীই এসেছে ভারত থেকে। আর এতগুলো অভিন্ন নদীর ভেতরে কেবল একটির ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পানিবণ্টন চুক্তি করতে পেরেছে। সেটা গঙ্গায় ফারাক্কা ব্যারাজের স্বীকৃতি দিয়ে (শর্মা, ১৯৯৯) অথচ এই ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের পদ্মা আজ মৃতপ্রায়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গও রেহাই পায়নি এর কুপ্রভাব থেকে।

দুনিয়াজুড়েই নদীর বারোটা বাজানো প্রকল্পগুলোর ভেতরে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ আছে এক নম্বরে। অথচ একেই বলা হয়েছে উন্নয়নের চিহ্ন! জওয়াহেরলাল নেহরুর ভাষায় 'আধুনিক ভারতের মন্দির'। ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণকারী দেশ। প্রায় ৫,০০০ বড় বড় বাঁধ ভারতে নদীগুলোর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। বাঁধের ফলে খোদ ভারতেই উদ্বাস্তু হয়েছে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ

দুনিয়াজুড়েই নদীর বারোটা বাজানো প্রকল্পগুলোর ভেতরে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ আছে এক নম্বরে। অথচ একেই বলা হয়েছে উন্নয়নের চিহ্ন! জওয়াহেরলাল নেহরুর ভাষায় 'আধুনিক ভারতের মন্দির'। ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণকারী দেশ। প্রায় ৫,০০০ বড় বড় বাঁধ ভারতে নদীগুলোর ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। বাঁধের ফলে খোদ ভারতেই উদ্বাস্তু হয়েছে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ (রুদ্র, ২০০৩)। কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া এখনো থামেনি, আরো নতুন নতুন বাঁধ নির্মাণের কাজে অগ্রসর হচ্ছে ভারত। এই সব বাঁধের ফলে বাংলাদেশে প্রবেশকারী অধিকাংশ নদীর প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নদীর মৃত্যু ঘটেছে। নদীতে ভারতের সবচেয়ে আগ্রাসী পরিকল্পনা হলো আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প, যা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। ভারত এই প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করছে কি না সে বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। অনেকেই বলছেন, এই প্রকল্প ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ভারত সরকার তা স্বীকার করছে না। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থ হবে বাংলাদেশের একটা বিরাট অংশের নদীর পানিশূন্য হয়ে পড়া এবং ফলে গোটা বাংলাদেশের অস্তিত্বই হুমকির সম্মুখীন হওয়া।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশসহ এই অঞ্চলে ভারতের আধিপত্যমূলক ভূমিকার মতোই নদী বিষয়ে ভারতের প্রকল্প একই সাথে নদী তথা প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও জবরদখলি ভোগের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। ভারতের আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প গ্রহণের গোড়ায় যে দৃষ্টিভঙ্গি তা হলো, নদী স্বাদু পানির অনন্ত আধার। আর তার প্রতিটি ফোঁটাকে কাজে লাগাতে হবে। তাকে সমুদ্রে পড়ে 'অপচয়' হতে দেওয়া যাবে না। সে কারণে যেখানে অধিক পানি আছে, সেখান থেকে খরাপ্রবণ এলাকায় পানি টেনে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু নদীকে 'সমুদ্রে পড়ে অপচয় হওয়া থেকে রক্ষা' করার আসল অর্থ হলো তার জীবনচক্র সম্পন্ন হতে বাধা দেওয়া। নদী সমুদ্র পর্যন্ত যেতে যে অসংখ্য লোকালয়, উদ্ভিদ, প্রাণীকে জীবন দিয়ে যায় তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। নদীর পানি সমুদ্রে পড়ে মিঠা ও নোনা পানির যে ভারসাম্য রক্ষা করে তা ধ্বংস করে প্রথমে উপকূলে ও পরে অন্যান্য অঞ্চলে লবণাক্ততা ছড়িয়ে দেওয়া। বাংলাদেশের মতো একটা সক্রিয় বদ্বীপে এর তাৎপর্য আরো গভীর। নদীমাতৃক বাংলাদেশকে নদী শুধু জন্মই দেয়নি, এখনো জন্ম দিয়ে চলেছে। প্লায়োস্টোসিন যুগে বঙ্গোপসাগর এখনকার চেয়ে ২০০ মাইল উত্তরে ছিল। সেখানে পলি জমে জমেই আজকের বাংলাদেশের ভূমি গঠিত হয়েছে। প্রতিবছর বঙ্গোপসাগরের পৃষ্ঠের উচ্চতা ৫-৭ মিলিমিটার বাড়ছে, কিন্তু এখানে উল্লম্বভাবে পলি জমার পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলেই বাংলাদেশ সমুদ্রে বিলীন না হয়ে বরং নতুন ভূমি লাভ করছে। কিন্তু নদীর ওপর অসংখ্য বাঁধ নির্মাণের ফলে ইতিমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে নদীর পলি বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা উদ্বেগজনকভাবে কমে গেছে। ১৯৭১ সালে যেখানে বঙ্গোপসাগরে ২.৫ বিলিয়ন টন পলি জমত, তা ১৯৯১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১.২ বিলিয়ন টনে (খালেকুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০০৪)। বর্তমানে তা আরো কম। এর সাথে আরো আরো বাঁধ ও নদী সংযোগ প্রকল্প যুক্ত হলে অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। এখন যদি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা অধিক হারে বাড়াকে বিবেচনা করি তাহলে বাংলাদেশের একটা বিরাট অংশ তলিয়ে যাওয়ার এবং আরো একটা বড় অংশ লবণাক্ততার কারণে কৃষিকাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে একটা নদীকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে তা প্রাণ-প্রকৃতি ও জনগণের জীবনকে ধ্বংস করছে তার আদর্শ

উদাহরণ হতে পারে তিস্তা। তিস্তা নদীর উৎস যে সিকিমে, সেখানে ৪টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছে, সেখানে পানি জলাধারে জমা করে রাখা হচ্ছে। ফলে প্রতিটি জলাধার থেকে কমপক্ষে ৫% পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাচ্ছে, পানিকে পলি ও জৈব পদার্থমুক্ত করে তার স্বাভাবিক প্রাণ নষ্ট করা হচ্ছে, বর্ষাকালীন প্রবাহ কমিয়ে ও স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থান নষ্ট করে জমিকে পলিবঞ্চিত করা হচ্ছে, মাছের প্রজনন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রতিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে (রুদ্র, ২০০৩)। এরপর তিস্তার সাথে মহানন্দা ও মেচি নদীর সংযোগের মাধ্যমে পানিকে বিহারে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর গজলডোবায় ভারত পানি প্রত্যাহার করে সেচ প্রকল্প চালাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে তিস্তা এক ক্ষয়িষ্ণু ধারা হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে। এর সাথে বাংলাদেশে তিস্তা ব্যারাজ খাতে পানি টেনে নিয়ে যাওয়া যুক্ত হয়ে নদীর বেশির ভাগটাই শুকিয়ে প্রায় নালায় পরিণত হয়েছে। নদীর বালু তার প্রস্থ বাড়িয়ে বিরাট অংশকে প্রায় মরুভূমিতে পরিণত করেছে। যার ফলে প্রায় এক লাখ হেক্টর উর্বর জমি এখন চরে পরিণত হয়েছে। তিস্তা সেচ প্রকল্পও প্রায় অকার্যকর হয়ে গেছে। তিস্তা ও গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে কার্যকর হওয়া সবুজ বিপ্লবের অধিক সেচনির্ভর কৃষি পদ্ধতির ফলাফলে আবাদের খরচ বেড়েছে, যা জোগাতে না পেরে ছোট কৃষক মজুরে পরিণত হয়েছে। নদী ধ্বংস হয়ে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে। জেলে, মাঝি তার জীবিকা হারিয়েছে। স্বাভাবিক চাষাবাদ, প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎস ধ্বংস হয়ে সমৃদ্ধ কৃষির অঞ্চল মঙ্গা অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়েছে। নিচে একটা সারণিতে ১৯৬৭-২০০৬ পর্যন্ত তিন মৌসুম দেখানো হলো :

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে একটা নদীকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে তা প্রাণ-প্রকৃতি ও জনগণের জীবনকে ধ্বংস করছে তার আদর্শ উদাহরণ হতে পারে তিস্তা। তিস্তা নদীর উৎস যে সিকিমে, সেখানে ৪টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছে, সেখানে পানি জলাধারে জমা করে রাখা হচ্ছে। ফলে প্রতিটি জলাধার থেকে কমপক্ষে ৫% পানি বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাচ্ছে

মৌসুম	সময়কাল	মাসিক সর্বোচ্চ প্রবাহ (কিউসেক)	মাসিক গড় প্রবাহ (কিউসেক)	মাসিক সর্বনিম্ন প্রবাহ (কিউসেক)
পূর্ণ/ভরা প্রবাহ মৌসুম	১৯৬৭-১৯৯০	১২৯৭৪৬	৬৯৫৭০	৩৬৪০৯
	১৯৯১-২০০০	১২৮৭৯৩	৭৫৫৭৩	৪৪৮৮৫
	২০০১-২০০৬	৭৯৭৭৬	৫৪৬৬৭	৩৪১১৪
মধ্যবর্তী প্রবাহ মৌসুম	১৯৬৭-১৯৯০	৪০৯৩০	১৮৩২৮	১০৯৪৮
	১৯৯১-২০০০	৩২৭০১	১৭৬৫৭	৯৭১২
	২০০১-২০০৬	২৭১৯২	১৪৪০৮	৬১৪৫
খরা মৌসুম	১৯৬৭-১৯৯০	৮০৫১	৫৯৬৮	৪৯০৯
	১৯৯১-২০০০	৭৯৮১	৫৩৬৮	৩৮৮৫
	২০০১-২০০৬	৪০২৬	২৮২৫	১৭৬৬

পানির এই হিসাব তিস্তা যমুনায় পড়ার আগে কাউনিয়া ব্রিজের কাছে করা। উল্লেখ্য, তিস্তা ও গজলডোবা–উভয় ব্যারাজের কাজ প্রায় একই সময়ে শেষ হয় ১৯৯০ সালে। কিন্তু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে, ১৯৯৩ সাল থেকেই এটা পূর্ণমাত্রায় কাজ করা শুরু করে। ১৯৯৬ সালের পর থেকেই ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহার শুরু কওে । এসবের প্রভাব নদীর ওপর কিভাবে পড়েছে তা আমরা ওপরের সারণিতে দেখতে পাচ্ছি।

তিস্তা যদি হয় নদী ধ্বংসের আদর্শ উদাহরণ তাহলে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে ধরনের জটিলতা চলছে তা দুই দেশের সম্পর্কের জটিলতারই একটা ধ্রুপদি উদাহরণ। তিস্তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও জন্মের আগে। পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র তিস্তা ব্যারাজ করার পরিকল্পনা ভারতকে জানালে ভারত আরো বিস্তারিত তথ্যের দাবি করে। পরে ভারতও গজলডোবা ব্যারাজ করার পরিকল্পনা হাতে নেয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ৩৬ ভাগ ও ভারত ৩৯ ভাগ পানি প্রত্যাহার করতে পারবে এবং নদীর জন্য ২৫ ভাগ পানি রেখে দেওয়া হবে–এই মর্মে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তা চুক্তি পর্যায়ে পৌঁছেনি (গ্লোবাল ভয়েস, ২০১২)। এরপর তিস্তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়নি। সব শেষে বাংলাদেশে মনমোহনের সফরের সময় এই চুক্তি হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এখন আবার ভারতের নির্বাচনের দোহাই পেড়ে তা পেছানো হচ্ছে। নতুন করে সমীক্ষার কথা বলা হচ্ছে এবং বরাবরের মতোই বাংলাদেশের শাসকদের উদ্যোগহীনতাই দৃশ্যমান বাস্তবতা আকারে হাজির আছে।

তিস্তা চুক্তি হয়নি। কিন্তু যেনতেন প্রকারে তিস্তা চুক্তি হয়ে গেলেও তা তিস্তার সমস্যার সমাধান করতে পারত না বহুবিধ কারণে। প্রথমত, চুক্তির শর্ত বিষয়ে নানা ধরনের গোপনীয়তা-অস্পষ্টতা বজায় রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই শর্তগুলো নানাভাবে এসেছে। কখনো এসেছে ২০ ভাগ নদীর জন্য রেখে ৪০ ভাগ করে ভারত ও বাংলাদেশ প্রত্যাহার করতে পারবে। কখনো ৫০ ভাগ করে ভাগাভাগির খবর এসেছে। কখনো নদীর জন্য ১০ ভাগ রেখে বাংলাদেশ ৪৮ ভাগ ও ভারত ৫২ ভাগ পাবে বলে বলা হয়েছে।[১] এ বিষয়ে সুনিশ্চিত তথ্য সরকার জনগণকে জানায়নি। এই ভাগাভাগি যদি গজলডোবা পয়েন্টে হয় তাহলে তার আগেই যে পানি প্রত্যাহার করা হচ্ছে তাকে কিভাবে হিসাব করা হবে, সে প্রশ্নে কোনো কিছু জানা যায়নি। আর যদি গজলডোবা পয়েন্টে নদীর প্রবাহকে পুরো প্রবাহ ধরা হয়, তাহলে এই ভাগাভাগি হবে নদীর ক্ষীণ হয়ে আসা প্রবাহের। ফলে তা বাংলাদেশে নদীর অস্তিত্ব রক্ষায় আদৌ সক্ষম কি না, সেটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, যে কোনো স্রোতস্বী নদীর ৩০-৩৫ ভাগ পানি মূল প্রবাহ আকারে রাখা না হলে সেই নদী ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য। যে কোনো নদীর পানির নবায়ন হারের চেয়ে বেশি পানি প্রত্যাহার নদীর জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে (ক্লাউডিয়া, ২০০১)। তিস্তা নদী নবায়িত হয় বরফগলা পানি ও বৃষ্টির পানি দিয়ে। এই বৃষ্টিপাতের ৭৭-৮৪% হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে (রুদ্র, ২০০৩)। ফলে বছরের অন্যান্য সময়, বিশেষত শুকনো মৌসুমে এই নদীতে স্বাভাবিক নাব্যতা বজায় রাখাটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেননা না হলে নদী পানি ধারণ ক্ষমতা হারাবে। ফলে বর্ষায় দু'কূল উপচে পুরো অঞ্চলই বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

তৃতীয়ত, নদীর ওপরে শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই নয়, নির্ভর করে নদীর উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল, তীরবর্তী এলাকার প্রতিবেশ, এমনকি মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি। সে কারণে নদীর স্বাভাবিক প্রাণ ও প্রবাহ বজায় রাখার প্রশ্নটি দিনে দিনে দুনিয়াজুড়েই অধিক মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠছে।

নদীর এই প্রবাহকে বলা হয় পরিবেশগত প্রবাহ (এনভায়রনমেন্টাল ফ্লো)। ২০০৭ সালের ব্রিসবেন ঘোষণায় এই পরিবেশগত প্রবাহকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে, '*পরিবেশগত প্রবাহ প্রবাহের পরিমাণ, সময় ও মানকে নির্দেশ করে, যা স্বাদু পানি ও মোহনার বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে এবং মানুষের সাধারণ জীবিকা ও নদী থেকে সে যেভাবে উপকৃত হয় তা অব্যাহত রাখতে সক্ষম*' (আর্থিংটন ও অন্যান্য, ২০০৯)। নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহ ও পরিবেশগত প্রবাহের ধারণার মধ্যে যেমন ফারাক আছে, তেমনি ন্যূনতম প্রবাহের ধারণার সাথেও তার পার্থক্য আছে। এক দিক থেকে বলা যায়, এটা এক ধরনের সমঝোতা। বর্তমান দুনিয়ায় নদীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ব্যবহারে বহু নদীর অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন, যা শুধু নদী কিংবা প্রকৃতি নয়, মানবসভ্যতার সামগ্রিক ভবিষ্যৎকেও হুমকির মুখে ফেলছে। আবার নানা প্রয়োজনে নদীর পানি ব্যবহারের প্রয়োজনও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রবাহ সর্বোত্তম না হলেও একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান আকারে হাজির হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবেশগত প্রয়োজন প্রবাহের মাত্রাভেদে মেটাতে হবে সেগুলোর একটা সারসংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো :

নিচুমাত্রার প্রবাহ: ১. জলজ প্রাণের আবাসের পরিসর প্রদান ২. পানির তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ও অন্যান্য জলজ রসায়ন ঠিক রাখা ৩. প্লাবনভূমির জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানির স্তর ঠিক রাখা ৪. অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীদের পানীয় জলের চাহিদা পূরণ ৫. মাছ ও উভচর প্রাণীদের ডিমকে নিরাপদে রাখা ৬. মাছের খাদ্য এলাকায় চলাচল নিশ্চিত করা ৭. তীরবর্তী স্যাঁতসেঁতে জমির উদ্ভিদের জন্মানোর নিশ্চয়তা প্রদান।

মাঝারি প্রবাহ : ১. নদীর মূল প্রবাহ সংলগ্ন খাল, শাখানদীর প্রবাহ ঠিক রাখা ২. নদীর তলদেশের বালু, নুড়ি, পাথর ইত্যাদিও আনুপাতিক পরিমাণ ও আকার ঠিক রাখা ৩. নদীর তীরবর্তী স্থলজ উদ্ভিদের নদীতে অনুপ্রবেশ ঠেকানো ৪. নদীর নিম্নমাত্রার প্রবাহের সময়কার দূষণ ও বর্জ্য সরিয়ে দেওয়া ৫. নদীর তলদেশে পলি জমা প্রতিরোধ ৬. লবণাক্ততার মাত্রা ঠিক রাখা।

ভরা প্রবাহ : ১. মাছের স্থানান্তর ও ডিম পাড়ার পথ তৈরি ২. নতুন জীবনচক্রের সূচনা ৩. মাছকে প্লাবনভূমির অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়া ৪. সংলগ্ন প্লাবনভূমিতে পানির স্তরের নবায়ন ৫. মাছ ও জলজ পাখির খাবারের নতুন উৎস সৃষ্টি ৬. প্লাবনভূমির উদ্ভিদের বিস্তার ও প্রাচুর্য নিয়ন্ত্রণ ৭. সংলগ্ন ভূমিতে পুষ্টির জোগান দেওয়া ৮. জলজ ও তীরবর্তী প্রজাতির ভারসাম্য রক্ষা ৯. জৈব ও কাষ্ঠজাতীয় বস্তুকে বহন করে নিয়ে যাওয়া ১০. নদীর সাথে সম্পর্কিত প্রবাহে প্রাণদান করা ১১. মাটির দীর্ঘস্থায়ী আর্দ্রতার জোগান দিয়ে তাকে নতুন প্রাণের উপযুক্ত করে তোলা (কিং ও অন্যান্য, ২০০৮; আইইউসিএন, ২০০৮)।

তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে এই পরিবেশগত প্রবাহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা	ভরা মৌসুমে (কিউসেক)	শুকনো মৌসুমে (কিউসেক)
উপচে পড়া (২০০%)	৬২৫৭৮	৬২৫৭৮
পূর্ণ প্রবাহ (৬০-১০০%)	১৮৭৮৭-৩১২৮৯	১৮৭৮৭-৩১২৮৯
খুব ভালো (৬০% ভরা মৌসুমে, ৪০% শুকনো মৌসুমে)	১৮৭৮৭	১২৫০১
বেশ ভালো (৫০% ভরা মৌসুমে, ৩০% শুকনো মৌসুমে)	১৫৬৪৪	৯৩৯৪
ভালো	১২৫০১	৬২৫১
চলনসই বা ক্ষয়িষ্ণু	৯৩৯৪	৩১৪৩
বাজে	৩১৪৩	৩১৪৩
সংকটাপন্ন	৩১৪৩	৩১৪৩

উৎস : মল্লিক ও অন্যান্য, ২০১০।

তিস্তা নদীতে এপ্রিল ২০১৪-তে প্রবাহ নেমে এসেছিল ১৭ কিউসেকে (৬০০ কিউসেক)।[২] এ থেকে পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। নদী ও তার তীরবর্তী অঞ্চলের প্রাণ-প্রকৃতির জন্য নদীকে সচল রাখতে সর্বনিম্ন প্রবাহ তো বটেই, এমনকি উপচে পড়া প্রবাহেরও আলাদা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সে রকম প্রবাহ দূরে থাক, কোনোমতে নদীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রবাহও বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদীতে বজায় থাকাটাই এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিস্তার মতো বাংলাদেশে প্রবাহিত অন্যান্য অভিন্ন নদীকেও একইভাবে শুকিয়ে মারা হচ্ছে। ভারতীয় শাসকদের নদীর জবরদখলি মালিকানা প্রতিষ্ঠার যে তৎপরতা, তার বিপরীতে অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শাসকদের মিনমিনে স্বর আর দেশের অভ্যন্তরে নদীগুলোর দখল, দূষণ সামগ্রিকভাবে নদীমাতৃক বাংলাদেশের অস্তিত্বই আজ হুমকির সম্মুখীন করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যখন নদীমাতৃক বাংলাদেশে আমাদের পানির অভাবে মরতে হবে। আর তা না চাইলে আমাদের সক্রিয় হওয়া দরকার এখনই।

আবুল হাসান রুবেল: অধ্যক্ষ, আমাদের পাঠশালা। প্রতিবেশ আন্দোলনের সংগঠক।
ইমেইল: ahrubel@gmail.com

তথ্যসূত্র

[আইইউসিএন] IUCN (2008), Flow: The Essentials of Environmental Flow.

[আর্থিংটন ও অন্যান্য] Arthington, Angela H. et al (2009), Preserving the Biodiversity and Ecological Services of River.

[ক্লাউডিয়া] Claudiao O, Stockle (2001), Environmental Impact of Irrigation: A Review.

[কিং ও অন্যান্য] king, JM et al (2008), Environmental Flow Assessment of River:Manual For The Building Block Methodology.

[খালেকুজ্জামান ও অন্যান্য] Khallequzzaman, Md., Punnet Srivastava, Fazlay S. Faruque (2004), *The Indian River-Linking Project: A Biologic, Hydrologic, Ecological and Socio-Economic Perspective.*

[গ্লোবাল ভয়েস] Global Voice (2012), India, Bangladesh: Water disputes and Teesta River Diplomacy, available at http://globalvoicesonline.org/2012/06/08/india-bangladesh-water-disputes-and-teesta-river-diplomacy/

[মল্লিক ও অন্যান্য] Mullick R. A. et al (2010), Flow Characteristics and Environmental Flow Requirements for Teesta River.

মৃধা, শহীদুল্লাহ (১৯৯৯), *বাংলাদেশের নদ-নদীগুলোর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ*

[রুদ্র] Rudra, Kallayan (2003), Taming the Teesta, available at http://www.actsikkim.com/docs/Rudra_Taming_the _Teesta.pdf

শর্মা, সুনীল সেন (১৯৯৯), *ও গঙ্গা তুমি বহিয়াছ কেন*

অন্যান্যঃ

১. Teesta Water Issue: A few hard facts, Mungpoo News এবং বাংলাদেশ ও ভারত থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা

২. দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ২০১৪